International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 01-10
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.262

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘অগ্নিবলয়’ গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাঢ়বঙ্গের মানুষের সম্প্রীতির বহুমাত্রিক জীবনান্বেষণ

সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
মোবারক হোসেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.04.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Syed Mustafa Siraj (1930-2012) hailed from the Hijal region within the Kandi subdivision of the Murshidabad district. Through his portrayals of the lives of both Hindus and Muslims, he placed greater emphasis on the essence of humanity itself – transcending religious distinctions. In his view, all human beings are equal. During his time living in Rarh Bengal, he observed and witnessed firsthand the harmonious coexistence between the Hindu and Muslim communities. One of his most notable stories, centered on the theme of communal riots, is 'Agnibalay' (The Ring of Fire). Shahed is a central character in 'Agnibalay', the story currently under discussion. Shahed once resided in Rarh Bengal; however, at the time the story unfolds, he lives in Kolkata with three companions for work-related purposes. His life is thrown into peril as a result of the communal riots that erupt in Kolkata. In his helpless state, he finds himself reminiscing about his wife and son back in the village, as well as the images of communal harmony he had witnessed in Rarh Bengal. To escape the clutches of the riots, he sets out on the path leading back to his village. Lacking the funds to purchase a train ticket, he is aided by a man from Kolaghat – Binaybhushan Haldar – who buys him a ticket, enabling him to return home by train. During his journey back, he witnesses poignant instances of harmony between Hindus and Muslims. He observes an elderly Muslim widow encountering a young, pregnant Hindu woman who is returning from a hospital, writhing in pain. The elderly woman offers her assistance, drawing upon her own life experiences to help the young woman. Shahed perceives in this act not merely a gesture of aid, but a profound expression of maternal care and compassion – a sight that fills him with solace.

Keywords: Rarh Bengal, Humanity, Harmonious, coexistence, Riots, Poignant

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম কথাসাহিত্যিক। তাঁর জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত খোশবাসপুর গ্রামে। তিনি উত্তর রাঢ়ের মানুষ। রাঢ়বঙ্গের কান্দি মহকুমার হিজল অঞ্চলের প্রকৃতির কোলে তিনি বেড়ে উঠেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছাত্রজীবনে বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে যায়। তাঁর সাহিত্যযাত্রা আরম্ভ হয় কবিতা রচনার মাধ্যমে। তিনি সাহিত্য মনোনিবেশের জন্য কলকাতা মহানগরে পাড়ি দেন। কয়েক বছর পর গ্রামে ফিরে এসে ১৯৫০-৫৬ সাল অবধি মুর্শিদাবাদের লোকনাট্য ‘আলকাপ’

দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি আবার কলকাতা শহরে পাড়ি দেন। ১৯৫৮ সালে ইবলিশ ছদ্মনামে তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'কাঁচি' বাংলা সাহিত্যমহলে সাড়া ফেলে দেওয়ার পর থেকেই তিনি একের পর এক গল্প-উপন্যাস রচনা করে যান। সাহিত্য রচনার পাশাপাশি তিনি ১৯৭৩ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'- য় স্থায়ী চাকরিতে যোগ দেন। সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের দৃষ্টিতে সব ধর্মের মানুষজন সমান। তাঁর কাছে মানুষের আত্মিকযোগই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলছেন, "মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়।"[১] সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কখনও ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি মুর্শিদাবাদে বসবাসকালে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সুর বা চিত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। হিজল অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতি তাঁর মনন থেকে কখনও হারিয়ে যায় নি। তাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা হল দেশ, মানুষ ও প্রকৃতি। সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রকৃত মানব ও মানবসত্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রবহমান। ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত-

> "ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাইনে। লেখক হিসেবে আমি চরিত্র বেছে নিই দরকার অনুযায়ী। হিন্দু-মুসলমান মানুষ কিছু বুঝিনা। মানুষ বুঝি। এই দেশের মানুষ। তাদের ঘনিষ্ঠভাবেই চিনি। আমার কোন শুচিবায়ু নেই। মানুষ আমার কাছে প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতিই শাশ্বত এবং ঈশ্বর।"[২]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্য সম্ভারে রাঢ়বঙ্গীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁর রচিত গল্প 'সাজ ভেসে গেছে' এবং বিভিন্ন উপন্যাস যেমন- 'নিষিদ্ধ প্রান্তর', 'হিজল কন্যা', 'তৃণভূমি' প্রভৃতি উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির চিত্র দেখতে পাই। 'সাজ ভেসে গেছে' গল্পের অন্যতম চরিত্র মইলোবাস বেহুলা লক্ষিন্দর পালায় চাঁদ সওদাগর চরিত্রে অভিনয় করে মানুষের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে লৌকিক সংস্কৃতি বজায় রাখে। এই পালায় অমূল্য বাউরী বেহুলা সাজে, আকাশ আলি লক্ষীন্দর সাজে এবং নারাণবাবু তবলাবাদক। তাদের মধ্যে কোনো ধর্মের সংঘর্ষ ও ভেদাভেদ নেই, তারা মিলেমিশে একসঙ্গে জীবনের জয়গান গেয়ে যায়। 'নিষিদ্ধ প্রান্তর' উপন্যাসের একজন মুসলিম মেয়ে রুবির সঙ্গে হিন্দু যুবক সুনন্দর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম থেকে প্রকৃত মানুষের মূল দিকগুলি বড় হয়ে উঠেছে। 'নিষিদ্ধ প্রান্তর' উপন্যাসটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষের মানবতাবোধকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্য সৃজনশীলতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের গুরুত্বপূর্ণ অবদান পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলামের উক্তিটি স্মরনযোগ্য-

> "কলকাতায় শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পরিস্থিতির চাপে ফিরলেন জন্মভূমি গ্রাম খোশবাসপুরে। পরে আবার কলকাতা। লিখলেন 'অগ্নিবলয়' ও 'শহর যখন জ্বলছে আগুন'... রাঢ়বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি তাঁরই অজান্তে বা অবচেতনায় অন্য চেতনাবলয় ও চোরাগোপ্তা পথে আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।"[৩]

আমাদের আলোচনার মুখ্য গল্প হল 'অগ্নিবলয়'। এই গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাঢ়বঙ্গের মানুষজনের জীবনের বহুমাত্রিক গুঞ্জন পরিলক্ষিত হয়। উক্ত গল্পটির বহুমাত্রিক জীবনান্বেষণই আমাদের প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অগ্নিবলয়' গল্পটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। গল্পের অন্যতম মূল চরিত্র শাহেদ রাঢ়বঙ্গের হিজল অঞ্চলের মানুষ। তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বহরমপুরে বসবাস করে। শাহেদ চাকরির উদ্দেশ্যে কলকাতা মহানগরে পাড়ি দেয়। শাহেদের সঙ্গে আরও তিনজন থাকে যাদের নাম গনিমিয়াঁ, জলিলমিয়াঁ ও নুরুল হক। গল্পের আরম্ভে পরিলক্ষিত হচ্ছে কলকাতায় দেশবিভাগ পরবর্তী দাঙ্গার চিত্র। দাঙ্গার

কবলে পড়ে তাদের মনে ঈশ্বরের নাম তখন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। কারণ কলকাতা মহানগরের বুকে ঈশ্বরের নামে চারদিকে হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ হয়েছে। গনিমিয়াঁ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ব্যক্তি। সে পাসপোর্ট ভিসার গন্ডগোলে এক বছর ধরে বিবিজানের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তাই শাহেদের কাছে গনিমিয়াঁ স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য ছন্দবদ্ধ ভাষায় চিঠি লিখে মেইল করে। শাহেদের প্রতি বিশ্বস্ততায় চিঠি লিখে মেলে পাঠালেও সাহেবদের প্রতি তার ভরসা হয় না। গনিমিয়াঁর ধারণা, "ওরা বর্ডার পার হওয়ার আগে খতটা খুলে পড়বে না তো? আল্লা জানেন, আমি সরকারি বাত ভেজিনা খতে।... শালারা পড়ে ফেলতে পারে হাওয়াই জাহাজে বইস্যা! কী বলেন?"[৪] গনিমিয়াঁর প্রশ্নের উত্তরে শাহেদের ইতিবাচক ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়, "পড়ুক না ব্যাটারা অগো দিল আপনা বিবির লেগে ভি হু হু করে উঠবে।"[৫] শাহেদের চিন্তা-ভাবনায় সমান মানুষের ভাবনার পাশাপাশি বিবাহিত জীবনে নারীদের একা থাকার অসহায় যন্ত্রণা কোনোদিক থেকে সে এক করে দিতে চাইছে। দাঙ্গার কবলে পড়ে গনিমিয়াঁ যখন শাহেদকে বাইরে নিয়ে আসছে তখন কলকাতার মানুষের হাতে হাতে তাদেরকে মারার জন্য বিভিন্ন অস্ত্র-সরঞ্জাম দেখে তারা ব্যাকুলিত ও পলায়নরত। গনিমিয়াঁ পাঁচিল টোপকে পালাতে উদ্যত। মানুষের হাহাকারের মাঝে মোটর সাইকেলের শব্দে সকলের মনে জাগে যে হয়তো পুলিশ আসল। সেইজন্য সবাই নিঃশ্চুপ, তাদের মনে ভয় জেগেছে। কিন্তু সেটা পুলিশের গাড়ি নয়। পুলিশের বদলে সার্জেন্টের গাড়ি চলে গেল। পুলিশও তাদেরকে বিপদের সময় নিরাপত্তা দিতে অপারগ। সার্জেন চলে যাওয়ার পর আবার ঈশ্বরের জয়ধ্বনি বেজে উঠল চারদিকে। উত্তপ্ত পরিবেশে আগুনের লেলিহান ও মানুষের প্রচণ্ড হুংকারে শাহেদ তীব্রভাবে অনুভব করল যে সে নিহত হবে। নিয়তিবোধ শাহেদকে পলকে পলকে অস্থির করেছিল। তাইতো বিপন্নতায় দাঙ্গার সময় শাহেদের অনুমান হয়, মাথায় ডান্ডা মারা হবে কিংবা পেটে ও বুকে ছুরির ফলা ঢোকানো হবে। কণ্ঠনালীতে তলোয়ার ঢুকে যাবে। মরবার সময় তার চিন্তা লোপ পাবে কিনা বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনায় তার বুক ফেটে কান্না আসার মুহূর্তে স্ত্রী রুনির কথা চিন্তনে ফিরে আসে। শাহেদের মনে রুনির মুখটা ভেসে ওঠে। রুনির সঙ্গে সঙ্গে তাদের তিনটি সন্তান বা বাচ্চার মুখ ভেসে ওঠে। শাহেদ কলকাতা আসার আগে রুনি তাকে বলেছিল, 'কলকাতায় থাকবে তুমি। সেখানে কত সুখ। জীবনটা ফুলে ভরে উঠবে তোমার। এই আমি চেয়েছিলাম'। রুনির অনুভূতির দিকে সজাগ অনুভূতি রেখে শাহেদ বলেছিল, 'তোমাকেও একদিন নিয়ে আসব রুনি আমার পাশে জীবন কানায় কানায় ভরে উঠবে নাগরিক সুখে'। সমস্ত ভাবনার মাঝে শাহেদ মহানগরে বাস্তবতার কাছে আজ বিপন্নতায় পরিণত হয়। শাহেদ ভেবেছিল রুনির জন্য একখানা ছাপানো শাড়ি কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে। কিন্তু সেগুলি আর হচ্ছে না! রুনির পাশাপাশি তুলতুলে তার বেড়াল মেয়েটির চঞ্চলতার কথা মননে আসে। ছোট বাচ্চা মেয়েটি চুপিচুপি তাকে বলেছিল, 'বাবু, কলকাতায় পাখি নেই? শুধু মানুষ? অনেক মানুষ'?... টুকু ভাইয়ের কথার পুনরাবৃত্তি বাচ্চা মেয়েটি তার বাবার সামনে বলে। টুকু গ্রাম ভালোবাসে। টুকুর কলকাতায় কেবল চিড়িয়াখানা ভালো লাগে। টুকুর ভালো-মন্দ কথার যুক্তিতে রুনি বলেছিল, 'টুকুটা একেবারে কী যেন একটা'। ছেলে-মেয়েদের খুনসুটি শাহেদ সেবার বহরমপুরে গিয়ে বুঝেছিল। শাহেদ গ্রামের মানুষ হিজল অঞ্চলের পাশাপাশি বহরমপুরে থাকে। গ্রাম তার ভালো লাগে। রুনি টুকুর কথা বলে, 'ও কবি হবে দেখে নিয়ো'। রুনির কথার পরিপ্রেক্ষিতে শাহেদ বলেছিল, 'বিচিত্র নয়। আমিও একসময় কবিতা লিখতাম গ্রাম ভালো লাগত'।... শাহেদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে রুনি বলে, 'আমার ভালো লাগে না বাপু'। রুনির এ কথা বলার কারণ সে শহরে মানুষ হয়েছে। এখন গ্রামে একা থাকে মেশবার লোক নেই। তার শহরে থাকার ইচ্ছা। শাহেদকে শহরের কাছে পাওয়ার অনুরণে বলে, 'কিন্তু বিয়েটা তোমার সঙ্গেই হতোই'।[৬]

'অগ্নিবলয়' গল্পটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবন অভিজ্ঞতার গল্প। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ়বঙ্গের কান্দি শহরের মানুষ। একসময় তিনি নিজের অবস্থান বুঝে সাহিত্যিক হওয়ার জন্য গ্রাম থেকে মহানগর শহর

কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর রচনায় গ্রামের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। স্ত্রীর সঙ্গে শহর ও গ্রামের ভালো-মন্দ, তর্ক-বিতর্কের প্রসঙ্গটিতে বলতে পারি যে শাহেদ চরিত্রটি তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ দর্শনের সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে ও 'অগ্নিবলয়' গল্প সম্পর্কে সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাক্ষাৎকারটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য-

> "চারদিকে চিৎকার করে গাছপালা, নদীর কাছ থেকে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা উচ্চারিত হত। এটা প্রকৃতির মতো স্বাধীন হাওয়া। একটা গাছ যেভাবে স্বাধীন, নদী বয়ে চলেছে নিজের স্বাধীনতায়। এই স্বাধীনতার স্রোতই তার কাম্য। প্রকৃতির মধ্যে এই স্বাধীনতার স্রোত আমাকে খুব টানে। আমার 'অগ্নিবলয়' গল্পে এর উল্লেখ আছে।"[৭]

শাহেদের মনে স্ত্রীর কলকাতা আসার আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র ভবিষ্যৎ সুখের কথাগুলি অকপটে ভেসে উঠলে বর্তমানে শহর ও গ্রামের তুলনা তাকে অসহায় করে তোলে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার চিন্তা-ভাবনা যে, মৃত্যুর পর রুনি ও তার বাচ্চারা কী করে বেঁচে থাকবে? এই চিন্তা তাকে বড্ড অবাক করে। বিপন্নতায় সে অস্তিত্বের অনুভব করে। তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলায় জন্মভূমি ও মাতৃত্বের অনুভূতি গল্পটিকে অন্যতম পর্যায়ে নিয়ে যায়-

> "শাহেদের কোনো সংবাদ কোনোদিন আর রুনি পাবে না। সুতরাং রুনি... সুতরাং বাচ্চারা... রুনি কি এমব্রয়ডারির কাজ দিয়ে গ্রামে কিছু সুবিধা করতে পারবে? গ্রামের প্রতিবেশী সোনাই শেখের মৃত্যুর পর তার যে-ছেলেগুলি শাহেদের খাওয়ার সময় সারবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকত, এই কোলাহল ও মৃত্যুর মধ্যিখানে লোকগুলির প্রত্যেকের বাচ্চাগুলিকে অদূরে কিংবা বহুদূরে সারবদ্ধ দাঁড়ানো দেখল শাহেদ। রুনি এবং তার বাচ্চারাও। আঃ মাগো! গলার নীচে ঘুলিয়ে ওঠে কান্নার ঢেউ। কিংবা কান্নার একটা অভ্যন্তরীণ তীক্ষ্ণধার ছুরি বিধতে থাকে অস্তিত্বের সর্বাবয়বে। ওর মৃতা মায়ের মুখ ভেসে উঠল, সকল কোলাহল আগুন, আলো ও শব্দসমূহের উপর। মাগো! আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"[৮]

শাহেদ অসহায়তার মাঝে মাকে অনুসরণ করেই কথাগুলি বলে, "মাগো! আমাদের কি অন্য কোন ঈশ্বর নেই?"[৯] ঈশ্বর ধ্বনির সঙ্গে যখন চারদিকে হল্লা বাড়ছে, আগুন শিখার সঙ্গে গুলির শব্দ মাতোয়ারা হয়ে ছুটছে তখন শাহেদ নিজেকে প্রস্তুত করে। সে বাঁচবার উপযোগী কথা বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। ওরা যখন চিৎকার করে, "ওরা যখন এই প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়বে, আমি চিৎকার করে বলব, মানুষ! মানুষ! তোমরা কী করছ তা জান না।"[১০] শাহেদ ধর্মের ঊর্ধ্বে প্রকৃত মানুষ খোঁজে। শাহেদের কথায় নৃশংসতার মাঝে প্রকৃত মানবতার কথা প্রকাশিত হয়। মানুষের মতো মানুষের কথারই প্রতিধ্বনির মাধ্যমে স্বাধীনতার কথা উল্লিখিত হতে থাকে-

> "শাহেদ অনুভব করে তার রক্ত, ইচ্ছা ও অনুভূতি তীব্রস্বরে তারস্বরে নিজেদের শুধু মানুষ প্রতিপন্ন করতে চাইছে। শাহেদের ইচ্ছে প্রচন্ড আওয়াজ তুলে বলে, 'এসব কেন ঘটবে?... আমরা যা হতে চাই, তা হতে পারিনে কেন? তোমরা ভেবে দ্যাখো।"[১১]

শাহেদের উক্ত জিজ্ঞাসাগুলি দাঙ্গাবাজ মানুষদের বিরুদ্ধে, যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব, সম্প্রীতি কেড়ে নিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে। সে চায় তার আসমুদ্রহিমাচল মথিত করে পশ্চিমে সিন্ধু-করাচি থেকে পূর্বে পদ্মা-মেঘনা প্রকৃতির কোলে ছড়িয়ে পড়ুক। ছড়িয়ে পড়ুক তার সোচ্চারিত মানুষের সম্প্রীতির আওয়াজ- মানুষ হতে চায় তা কেন হতে পারছে না? শাহেদের কথাই যে প্রশ্নগুলি দৃষ্টিগোচরে আসে তা হল জীবনে প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ইচ্ছা অনুযায়ী, স্বাধীনতা অনুযায়ী, প্রকৃতি যেমন স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, ঠিক তেমনি। কিন্তু তা হচ্ছে না, কেউ কেউ হতে দিচ্ছে না। তাইতো দাঙ্গার কবলে পড়ে তার সঙ্গী গনিমিয়াঁকে সে আর খুঁজে পাচ্ছে না। যে তার স্ত্রীর কাছে এক বছর না যেতে পারার জন্য ছন্দবদ্ধ ভাষায় চিঠি

লিখে নিয়েছিল। সেই গনিমিয়াঁ দাঙ্গার ভয়ে পাঁচিল টপকে কোথায় গেছে সে জানে না। হয়তো বেঁচে আছে, হয়তো মারা গেছে। সে উত্তরের বাইরে। শাহেদ যখন গনিমিয়াঁকে ডেকে সারা পেল না। তার পরিবর্তে পাঞ্জাবি লোক আকবর খাঁ-এর গলার আওয়াজে শাহেদ সংবিৎ ফিরে পায়। সে 'নারায়ে তাকবির', 'আল্লাহু আকবার' বলে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে বললে শাহেদ কিন্তু তা করে না। আকবরের মুখে বাইরে দাঙ্গার প্রকৃত অবস্থা জানে। পশ্চিমা হিন্দু-নাপিত বিশ্বনাথ মুসলমানদের হয়ে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে সোডা-বোতল ছোড়ার ফলে দাঙ্গা কিছুটা স্তিমিত হলে দমকলের মাধ্যমে আগুন নিভে যায়। কিন্তু আফজালের মায়ের কণ্ঠস্বর শাহেদ শুনতে পায়, "হাই বাছা! আমার সোনার সংসারটা জ্বলে গেল।"[১২]

শাহেদ ও সঙ্গী তিনজন একটি ঘরেই থাকে। দাঙ্গার কবলে গনিমিয়াঁ এখন নিখোঁজ। বাকি দুইজন জলিলমিয়াঁ ও নুরুল হক শীতের রাতে দাঙ্গায় ঘরের বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শাহেদের চোখভরে ঘুম আসে কিন্তু ঘুমাতে পারে না। তার শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে ভাবতে ভালো লাগে। অন্ধকারে দাঙ্গার মধ্যে রুনির প্রতিচ্ছবি ভাসে। রুনির তিন সন্তানের জন্ম হওয়াতে শরীর ভেঙে পড়েছে। হার্টের অসুখে এখন সে অসুস্থ। শাহেদ জীবনের দোরগোড়ায় রুনির পাশাপাশি রাঢ়বঙ্গের হিজল প্রান্তরের চিত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি খুঁজতে থাকে। তার জন্মভূমির মাঝে বিচ্ছিন্নতা নেই। নেই কোনো দাঙ্গার চিত্র, সকলে মন্দির-মসজিদে কাঁসরঘন্টার ধ্বনি ও আজান শুনে মিলেমিশে দিন পার করে। উক্ত চিত্রে শাহেদ বঙ্গ প্রকৃতির কোলে জীবনের গুঞ্জনে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চায়, তাইতো তার মনের ভিতর থেকে কথাগুলি উঠে আসে-

> "মাগো! কোথায় সেই গ্রাম?... সন্ধ্যার ঘন নীল কুয়াশা। ঢালু আকাশ বেয়ে রোদের বেনু।... মাগো! আমি আবার সোনালী নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওপারের হিজলের প্রান্তর ও বন পেরিয়ে আসা গাভীর গলার ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি। দূরে মসজিদে নঈম শেখের আজান এবং বামুনপাড়ায় মন্দিরে কাঁসরঘণ্টার ধ্বনি। নঈম শেখের আওয়াজটা কাঁপছে। বামুনপাড়ায় কাঁসরধ্বনি কাঁপছে। গাভীর গলার ঘণ্টাটা অবিশ্রান্ত কেঁপে কেঁপে ধাবমান। সব ছাপিয়ে বাছুরের তীব্র ডাক, মাগো!"[১৩]

মাতৃভূমির টান, যেখানে শাহেদ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে একত্রিত হয়ে থাকে। সেই ঐক্যচেতনার স্মৃতি মনে হওয়ায় শাহেদ মহানগর থেকে আবার ফিরে যেতে চায় গ্রামে। ঘরের মধ্যে দু'জন অচৈতন্য অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকলেও শীতের রাতের কাতরানি ও দাঙ্গার ভয়াবহতায় তারা ভয়াতুর হয়ে ওঠে। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। গভীর রাত্রে শাহেদ পরিবার থেকে শুরু করে সমস্ত ভাবনায় ব্যাকুলিত হয়। রুনির বড়ো বোনের অসহায়তার কথা মনে হয়। কান্দি শহরে বিনোদিয়ায় শীতের মেলা হয়। রুনির বড়ো বোন শ্বশুর বাড়ির জ্বালাতনে অসহায়। নারী নির্যাতনের দিকটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর গল্পে জীবনের বহুমাত্রিক অন্বেষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। বড়ো বোন নিজেকে 'হতভাগিনী' বলে অভিহিত করে। কারণ বাবার মৃত্যুতেও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মরামুখ দেখতে যেতে দেয় নি। তাই নিজেকে হতভাগিনী বলে। বড়ো বোন যাতে শান্তি পায় সেইজন্য বিনোদিয়ার মেলায় শাহেদসহ রুনিকে আহ্বান করেছিল। শাহেদের মনে সমস্ত চিত্র এখন অবলোকিত হয়। পরিবারসহ বিনোদিয়ার শীতের মেলার যাত্রা শাহেদের স্মৃতিকহনে বিরাজমান। তার জীবনের বহুমাত্রিক দিকগুলি বিপন্নতার মাঝে একটার পর একটা চিত্রিত হতে থাকে। তার স্মৃতিকহনে মায়ের নরম কোলটিও হারিয়ে যায় নি।

শাহেদ শীতের রাতেও ঘামছিল। ঘর্ম নিঃসরণে সে রাঢ়বঙ্গের বহুমাত্রিক জীবনের গুঞ্জন খুঁজে নেয়। সে দেখতে পায় রাঢ়বঙ্গের জীবনের গুঞ্জন। শীতের সকালে সোনালী নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো চাষীরা হাতে খুরপি নিয়ে ঠান্ডা জল পায়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওপারের হিজল মাঠে এগিয়ে চলেছে। হিজলের মাঠে কেটে রাখা

ধানের শিষ যেগুলি সারারাত্রি শিশির ভিজে সারবদ্ধ শুয়ে আছে সেগুলি আনার জন্য বা পাহারা দেবার জন্য যোগীবর কুনাই ও বাইতুল্লা শেখ স্বপ্নে বিভোর।[১৪] রাঢ়বঙ্গের শীতের ফসল কাটা-তোলার প্রসঙ্গে জীবন গুঞ্জনের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ রাঢ়ের সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের 'পরবাসী' গল্পটি প্রাসঙ্গিক। সেটিও দেশবিভাগ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গল্প। দাঙ্গার কবলে পড়ে যখন বশির ওয়াজদ্দি চাচাকে ও পরিবারকে হারিয়ে শীতের রাতে পালাতে পালাতে বিপন্ন তখন সেও তার রাঢ়বঙ্গ গ্রামের গুঞ্জন ভুলতে পারে নি। 'অগ্নিবলয়'-এর শাহেদ আর 'পরবাসী' গল্পের বশির একই মাত্রায় বিরাজমান। তারা দুজনেই নিরীহ মানুষ, তারা বঙ্গসন্তান। রাঢ়বঙ্গের মাঝে তারা সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধনেই বেঁচে থাকে। 'পরবাসী' গল্পে জীবনের গুঞ্জন নিম্নরূপ-

> "বশির ওয়াজদ্দি এগুলো। সকাল হয় নি এখনও। পাতলা একটা কুয়াশা পড়েছে। কালচে রঙের মাটি অল্প ভিজে আর পাথরের মত কঠিন। গরুর গোয়াল থেকে ধোঁয়া এসে কুয়াশায় মিশছে। ভারী একটা পর্দা পড়েছে গাঁটিকে ঘিরে। সেই পর্দা ভেদ করে ওরা মাঠে এসে পড়ল। ভিজে ভারি ধানের লুটিয়ে পড়া শিষ চাবুকের মত আঘাত করে পায়ের গোছায়। শিরশির করে বাতাস দেয়, ধানে ধানে ঘষা লেগে শন-শন শব্দ হতে থাকে।
>
> এই অল্প একটু শব্দ ছাড়া বিরাট খোলা মাঠের কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্ধকারে ছায়ার মত মানুষগুলোকে হুস হুস করে হাঁটতে দেখা যায়। তারপর কুয়াশার পাতলা চাদর ছিঁড়ে হঠাৎ সূর্যের অজস্র আলোয় মাঠ ভরে উঠতেই দেখা যায় বিরাট মাঠ প্রায় জনারণ্য। তখন একটা শব্দ ওঠে, বিশাল গম্ভীর গুঞ্জন- মাঠের আকাশ এবং বাতাস বেষ্টন করে বাঁচতে থাকে এর অন্য কোন নাম নেই একে জীবনের গুঞ্জন বলা চলে। বেঁচে থাকার গুঞ্জন উষ্ণ উত্তপ্ত চিরকালীন।"[১৫]

নঈম শেখ ও হিরু সদগোপ ফসলের শিষ গুলিতে হাত রেখে সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিল, সেসবের চিত্র শাহেদের অকপটে ভাসে। রাঢ়বঙ্গের শীতের ফসল তোলার পর যে বাঙালির জীবনে শীতে রাঙ্গা মাটিতে উজ্জ্বল করে নিকোনো চিত্র, দেওয়ালে ও প্রাঙ্গণে আতপচাল, খড়ি গোলার সাদা সাদা আলপনা বাংলার ব্রত-র চিত্রে শাহেদের মন থেকে সরে যায় নি। বাঙালির লৌকিক সংস্কৃতি, মেলায় কবিয়াল গানের চিত্র দাঙ্গার কবলে পড়ে শাহেদের মন ভুলতে পারেনা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মুর্শিদাবাদের আলকাপ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আলকাপ দলে ঘোরাঘুরির সময় হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধন নয়নে পুলকিত হয়েছিল। দেখেছিলেন কবিগানের লড়াইয়ে শেখ গোমানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন লম্বোদর চক্রবর্তী। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু আসর জমানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আলোচ্য 'অগ্নিবলয়' গল্পটিতে শেখ গোমানি ও লম্বোদর ঠাকুর দুই কবিয়ালের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। মেলায় হাজার লোকের ভিড়ে শেখ গোমানি ব্রাহ্মণ সেজে গান ধরেছে, 'আমার বুকের রক্তে হোক মা এবার তোমার পায়ের আলপনা'। লম্বোদর ঠাকুর গাইছেন, 'আহা পিরীতি কী ধন! কবি বলেছেন- সিরাজের সেই প্রিয়া যদি মুগ্ধ করে মোর হিয়াকে/ তাহার লাগি দিতে পার সমরখন্দ-বোখারাকে'। মেলার আসরে শ্রোতারা গান শুনে জয়ধ্বনি দিয়েছে, "'আল্লা- হরি হরি বোল! হরি আল্লা আল্লা বোল'।"[১৬] মেলার আসরে রাঢ়বাংলার বুকে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি শাহেদকে ও মানুষজনকে মুগ্ধ করে রাখত। আর বর্তমানে সেই সমস্ত মানুষদের শরীরকে নিয়ে কলকাতা রক্ত গঙ্গায় আর্তনাদ করতে বসায় শাহেদ ব্যাকুলিত হয়ে পড়ে। রাত্রি জাগরণ করতে করতে রাত্রি দুটোর সময় সোনালী নদীর তীরে হিজল বিলের দেশে কবিয়ালদের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধান করে শাহেদ। তার ধারণা ঈশ্বরও আজ কলকাতা থেকে কবিয়ালদের আসরে পালিয়ে গেছেন।

রাত্রিপারে পথে নিঃশব্দ জনস্রোত। কেউ কারোর দিকে না তাকিয়ে নিজের নিজের গন্তব্যস্থলে সকলে রওনা দিয়েছে। দাঙ্গায় আফজালের মায়ের সোনার সংসার জ্বলে গেছে। সেই আওয়াজ শাহেদের কানে আসে। আফজালের মায়ের বুকে কলকাতার হৃদয় সারাটি রাত ধরে গলে গলে পড়েছে। বদ্ধগলি ছেড়ে হাজার হাজার লোক, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবা, নারী সকলে ভয়ে পালাও রবে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। শাহেদ কলকাতার বুকে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে গ্রামের পথে রওনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কিন্তু ভয়ে যেতে পারছে না। এদিকে তার সঙ্গী নুরুল হক পালিয়েছে। জলিলমিয়াঁ তাকে যেতে বারণ করে। শাহেদ চলে গেলে সে একা হয়ে যাবে। তাই শাহেদের সামনে কেঁদে ফেলে। দাঙ্গার কবলে জলিলমিয়াঁরও ক্রন্দন শাহেদকে ভীষণভাবে আক্রান্ত করলেও সে থাকতে পারে না। সকলের ভিড়ে নিজেকে মিলিয়ে দেয়। দলে দলে বাক্স- প্যাটারা, বিছানাসহ স্টেশনে কখন পৌঁছল শাহেদ টের পেল না। তার পকেটে মাত্র চারটি টাকা ছিল। সেই টাকায় টিকিট পাওয়া নিয়ে সন্দেহ। হঠাৎ করে শাহেদের মনে প্রশ্ন জাগে কেন পালাবে? চাকরিটার লিখিত নিয়োগপত্র কয়েকদিন পরেই পেয়ে যাবে। চলে গেলে আর হয়তো পাবে না। সেই মুহূর্তে তার বন্ধু সুহাসের কথা মনে পড়ায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। সুহাস শেয়ালদায় থাকে। তাকে বলেছিল গোলমালের গতি খারাপ দেখলে তার কাছে যেন চলে আসে। সুহাস একসময় পূর্ব বাংলায় পরিবার নিয়ে বসবাস করত। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়। পূর্ব বাংলার দাঙ্গার বর্ণনা শাহেদের সামনে বলেছিল। পূর্ব বাংলার দাঙ্গার রাতের ঘটনা সুহাস কোনোদিন ভুলতে পারবে না। সেখানে গভীর রাতে চারপাশে দূরে ও কাছের গ্রাম থেকে চিৎকার আসত। আল্লাহর নাম ধরে চিৎকার। সেই চিৎকার সহ্য করতে না পেরে সুহাস খড়ের ভিতর লুকিয়ে ছিল দু-দিন। তারপর এক ভদ্রলোক মুন্নুমিয়াঁ তাদেরকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। মাথায় টুপি, পরনে লম্বা জামা, ঈষৎ দাড়ি প্রভৃতি পরিধান করে আত্মরক্ষায় শিয়ালদায় পালিয়ে আসে। তার স্ত্রী পারুল ও বাচ্চা দুটি নিয়ে নতুন জীবনে ফিরে আসে। কিন্তু মুন্নুমিয়াঁকে তারা মেরে ফেলে। সুহাস নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার মধ্যে সুহাসের প্রশ্ন জেগেছিল, "অবশ্যি মধ্যে মধ্যে মনে হয় এই কি চেয়েছিলাম আমি, আমরা? কী হতে চায়, কী হয়ে উঠি শিব গড়তে বাঁদর। কেন এমন হয়, সেটাই খোঁজা দরকার।"[১৭] তৎকালীন ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল গোটা ভারতবর্ষে তথা পূর্ববঙ্গ ও কলকাতায়। নিরাপত্তার কারণে হিন্দু-মুসলমান বসবাসের স্থান থেকে ভিন্ন ধর্মের পোষাক পরিধান করে আত্মরক্ষা করেছিল। এই উদাহরণ বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনায় পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ছুরি' গল্পটি স্মরণযোগ্য। 'ছুরি' গল্পের অন্যতম চরিত্র মনসুরের চাচা আনোয়ার সাহেব তার মেয়ে হাসিন ও মুনসুরের ভাই মুন্নুকে প্রাণে হারিয়ে পরিতোষবাবুর ধুতির বিনিময়ে দাঙ্গার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসে। 'ছুরি' গল্পের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

> "আমাদেরকে এখানে আজ সশরীরে দেখতে পাচ্ছ তার একমাত্র কারণ ধুতি। ভাগ্যিস পরিতোষবাবু এ দয়াটুকু করেছিলেন, না হলে আরও দশ জনের মতো আমাদেরও স্থান হত নর্দমায়। একটা সাদা ধুতি একজন মানুষকে রাখতে পারে, শেষ করতে পারে তা আগে কে জানত। পরিতোষবাবুর দয়া জীবনে ভুলব না। তবু সবাই কি আর আসতে পেরেছি?"[১৮]

শাহেদ সুহাসের মতোই পূর্ব বাংলার দৃশ্য কলকাতায় টের পেয়েছে। গোলমালের সময় সুহাসের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা হলেও যেতে পারে নি। কারণ সুহাসের বাড়ির প্রতিবেশীরা এক সময়কার উদ্বাস্তু এবং সুহাসের বউ পারুলও উদ্বাস্তু। হিংসা-দ্বেষ-বিদ্বেষ-ক্রোধ মানুষকে লেলিহান করে দেয়। উভয় সম্প্রদায়ে তৎকালীন সময়ে দাঙ্গার ভীষণ প্রভাব পড়েছিল। দাঙ্গায় একে অপরের সন্দেহ প্রবণতা তৈরি হয়। কেউ কারও সঙ্গে মিশতে পারে না, উভয় সপ্রদায়ের মানুষজন ভয় করে। তাই শাহেদ পর্যবেক্ষণ করেছিল সুহাসের বাড়ির প্রতিবেশীরা যেহেতু উদ্বাস্তু ফলে সুহাসের বাড়ি সাহস করে যেতে পারে না। বিপন্ন-বিস্ময়ের মাঝে তার মনের গভীরে প্রশ্ন

জাগে, "সুহাসের বাড়িতে যেন বা ঘাতক অপেক্ষা করে আছে কোথাও সন্তর্পনে।"[১৯] শাহেদ সোজা স্টেশনের দিকে রওনা দেয়। তার কাছে টিকিট কাটার যথেষ্ট ভাড়া ছিল না, দাঙ্গার কবলে মুসলমান বলে অন্য কাউকে বলতে পারছে না। হঠাৎ একটি লোককে মুসলমান ভেবে বাড়ি ফেরার জন্য টাকার অভাব বলায় ভদ্রলোক তার টিকিটসহ শাহেদেরও টিকিট কেটে শাহেদকে দেয়। আর শাহেদ কলকাতার পুরো দাঙ্গার বিবরণ ও তার বিপন্নতার কথা ভদ্র লোকের সামনে বললে ভদ্র লোক বলে, "সব থেমে যাবে দেখবেন। পিছনে কোনো হাত বোতাম টিপছে। টের পেলে লোকেরা চুপ মেরে যাবে।"[২০] ভদ্রলোকের কথায় তৎকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের ক্ষমতালোভী, শোষণকারী ও সাম্রাজ্যলোভী মানুষেরা চারপাশের মানুষজনকে লেলিয়ে উগ্র করেছিল তার ইঙ্গিত নির্দেশিত হয়। আলোচ্য গল্পে ভদ্রলোকের কথায় পিছনের মতলব বা দেশ বিভাজনকারী লোকদের উদ্দেশ্যের কথায় উঠে আসে। শাহেদ তার পরিচয় জানতে চায়লে নাম কার্ডে জানিয়েছে। সে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক কোলাঘাটের বিনয়ভূষণ হালদার। লোকটির নাম দেখে শাহেদ প্রথমে চমকে উঠলেও তাকে যে সাহায্য করেছিল তার গুণগান গাইতে বা নাম প্রচার করতে ট্রেনে যাওয়ার পথে কৃপণতা করে নি। সারা কলকাতাকে কাঁপিয়ে এপার-ওপার সারা বাংলাদেশ মথিত করে সকল মানুষের মনে তার মানবিক মূল্যবোধের অবদান ঘোষণা করেছিল। শাহেদ ও বিনভূষণ হালদারের মধ্যে কোনো জাতভেদ ছিল না। তারা হল সম্প্রীতির বাহক, প্রকৃত মানুষ। প্রকৃত মানবসত্তায় তারা একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়।

শাহেদ ট্রেন যাত্রাপথে হিন্দু-মুসলমান মানুষের সম্প্রীতি দু-চোখভরে দেখে। একের পর এক স্টেশনে ট্রেন থামে, যাত্রী নামে আবার যাত্রীর আগমন হয়। সেখানে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় না। নতুন স্টেশনে শাহেদের চোখে পড়ে, একটি মহিলা যাত্রীর কোলে শিশুটি অবিকল শাহেদের ছোট বাচ্চাটির মতো। অপরিচিত শাহেদ হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিল। মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর। রুনির মতো যুবতী। শাহেদ বাচ্চাটিকে কোলে নেওয়ায় মেয়েটির হাসি রুনির হাসির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শাহেদ ছেলেটির গালে গাল রাখল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অবস্থান ও বর্তমানের সম্প্রদায়গত সমস্যায় নিজেকে না মেলে ধরে জননীর কোলে সন্তানকে ফিরিয়ে দিয়ে কলকাতার আগুন জ্বালার পাশে বিনয়ভূষণ হালদারের সাহায্যের কথা স্মরণ করে। শাহেদ রাঢ়বঙ্গের মানুষ। তার মননে সম্প্রীতি হারিয়ে যায় না। সরস্বতীর পঞ্জিকাও সে ভুলে যায় না, মনে রাখে এবং অপরকে মনে করিয়ে দেয়। কাঁধে একজন সরস্বতী প্রতিমা নিয়ে গেলেও শাহেদ অন্য ব্যক্তিকে দুটি পঞ্জিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার ট্রেন থামল, আবার নতুন দৃশ্যের মাঝে গ্রাম বাংলার চিরন্তন সম্প্রীতির দৃশ্য শাহেদের চোখে দাঙ্গার অগ্নিবলয়ও দূরে সরে যায়। সে দুজন মানুষের মেলবন্ধন দেখতে পায়, একজন হিন্দু গর্ভবতী যুবতী অন্যজন পৌঢ়া মুসলিম চাষী ঘরের বিধবা মহিলা। যুবতী মেয়েটি হাসপাতাল থেকে ফিরছে এখনও সন্তান হতে দেরি আছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। মেয়েটির কাতর অবস্থা দেখে পৌঢ়া তার অভিজ্ঞতার কথা বলে তাকে সাহায্য করে। শুধু সাহায্য নয়, পৌঢ়া মহিলাটির সেবা যত্ন মাতৃ সমতুল্যর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পৌঢ়া মহিলাটি সন্তান হওয়ার অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিনী যুবতীর পেটের উপর হাত বুলিয়ে তার যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। উক্ত দৃশ্যে মানুষের ঐকান্তিকতার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এটা মানুষের ধর্মের সম্প্রীতির অভিব্যক্তির প্রকাশ। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের এরকম দৃশ্য দেখে শাহেদ উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে চাইল, "তোমরা কি জানো না মহানগরে আগুন জ্বলছে? হাজার হাজার মানুষ... তোরণদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে?"[২১] শাহেদের আত্মা আর্তনাদ করেছিল বারবার কিন্তু সেই আর্তনাদের ধ্বনি আশ্চর্য প্রতিধ্বনি নিয়ে ফিরে এসেছিল চলমান ট্রেনের কামরায়। তার মনোভাবে আনন্দ এখন উৎফুল্লিত হতে চায়। ট্রেন থেকে নামার সময় শাহেদ প্রকৃত মানুষের সম্প্রীতি দেখেছিল, "পৌঢ়ার কাঁধে মাথা

রেখেছে গর্ভিনী যুবতী এবং পৌঢ়া ওর পেটের উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এক প্রান্তের সম্ভাব্য মুসলমানগুলি নিবিড় সংহত চোখে দৃশ্যটি নিরীক্ষণ করেছিল। মানুষের জন্মক্ষণ সতত মানুষকে এমন সংহত করে।"[২২]

সংহত করে বলেই দূরের 'অগ্নিবলয়' দূরে সরে গিয়ে সম্প্রীতির সুরে মানব অঙ্গিকারে মৃত্যুর চেয়ে জীবন সতত মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম। বিশ্বভারতী,পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪৩১, কলকাতা,পৃ. ৪৬।

২। সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। 'আত্মকথা'। 'সমকালের জিয়নকাঠি', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, জীবন মণ্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পৃ. ৩৫।

৩। ইসলাম, সিরাজুল। 'অন্তহীন কথকতা ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ'। 'সমকালের জিয়নকাঠি', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, জীবন মণ্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পৃ. ৩০৫-৩০৬।

৪। বসু, বিষ্ণু। মিশ্র, অশোক কুমার সংকলন ও সম্পাদনা। 'সম্পর্ক' সম্প্রীতি বিষয়ক গল্প সংকলন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ৩৪০।

৫। তদেব, পৃ. ৩৪০।

৬। তদেব, পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

৭। সরকার, গৌরীশঙ্কর (সম্পাদক)। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মুখোমুখি। 'ঐক্য'। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩, হাবিবপুর, ডাক মেদিনীপুর জেলা, পৃ. ৪৩৬।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

১৫। হক, হাসান আজিজুল। 'গল্পসমগ্র' (১)। মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১২০-১২১।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।

১৮। সাহা সুশীল (সম্পাদনা)। সম্পাদনা সহায়তা মুখোপাধ্যায়। 'দেশভাগের গল্প: বাংলাদেশ'। গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ নভেরম্বর ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৭১।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

২১। প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৫৩।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। ইসলাম, মহঃ নুরুল। আলকাপ। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।

২। চক্রবর্তী, সাবিত্রী নন্দ। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট। করুণা প্রকাশনী, প্রথম করুণা প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৯, কলকাতা।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম। বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪৩১, কলকাতা।

৪। বসু, বিষ্ণু। মিশ্র, অশোক কুমার সংকলন ও সম্পাদনা। 'সম্পর্ক' সম্প্রীতি বিষয়ক গল্প সংকলন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা।

৫। সাহা, সুশীল (সম্পাদনা)। সম্পাদনা সহায়তা মুখোপাধায় শৌভিক। দেশভাগের গল্প: বাংলাদেশ। গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ নভেরম্বর ২০১৭, কলকাতা।

৬। হক, হাসান আজিজুল। গল্পসমগ্র (১)। মাওলা ব্রাদার্স, মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকা।

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি:

১। মণ্ডল নাজিবুল ইসলাম (সম্পাদক)। 'সমকালের জিয়নকাঠি'। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, জীবন মণ্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

২। সরকার গৌরীশঙ্কর (সম্পাদক), 'ঐক্য' সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩, হাবিবপুর, ডাক মেদিনীপুর জেলা।

আন্তর্জাল:

1. https://shodhganga.infilibnet.ac.in
2. https://www.wikipedia.org